বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা

হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে যে সব শিশু রোগী আসে তাদের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধীতা বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা প্রায়ই দেখা যায়। বাংলাদেশে ৩.৮% শিশুর মধ্যে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা পাওয়া গেছে। বিদেশী গবেষণাগুলোতে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের শতকরা দুই থেকে তিন ভাগের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা থাকে। এই প্রতিবন্ধীদের ৭৫% থেকে ৯০% এর মৃদু মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা রয়েছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার তিনটি লক্ষণ থাকেঃ

প্রথমতঃ এদের বুদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় কম থাকে। ওয়েক্সলার ইন্টিলিজেন্স স্কেল অনুযায়ী এদের আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক সত্তর বা তার কম থাকে।

দ্বিতীয়তঃ জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার দক্ষতার ক্ষেত্রে এই শিশুদের যথেষ্ঠ ঘাটতি থাকে। যেমন, এদের অন্যদের সাথে ভাববিনিময় বা যোগাযোগের দক্ষতা কম থাকে, নিজের যত্ন নিজে নেয়ার ও সংসারে টিকতে হলে যে সাধারণ দক্ষতা গুলো থাকা দরকার সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, সামাজিক দক্ষতার ঘাটতি থাকে, লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি থাকে, পেশাগত কাজের দক্ষতা, অবসর বিনোদনের দক্ষতা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর ক্ষেত্রেও এদের ঘাটতি থাকে।

তৃতীয়তঃ ব্যক্তির মানসিক প্রতিবন্ধীতার বিষয়টি তার আঠারো বছর বয়সের আগেই দৃশ্যমান হয়।

বেশীর ভাগ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুকে প্রথম দর্শনে বোঝা যায়না যে তাদের কোন সমস্যা আছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশ একটু দেরিতে হয়। তারা দেরিতে কথা বলতে শিখে, তাদের স্মৃতিশক্তি কম থাকে, মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা ও ধৈর্য্য কম থাকে, কোন কিছু শিখার ক্ষমতাও কম থাকে। যেমন, তাদের সামাজিক রীতি নীতি শিখতে সমস্যা হয়, তাদের সমস্যার সমাধানের দক্ষতার ঘাটতি থাকে, নিজের যত্ন নিজে নেয়া শিখতেও তাদের সমস্যা হয়। যেমন, অন্য বাচ্চা হয়তো দিব্যি টয়লেট করে পরিচ্ছন্ন হয়ে বের হচ্ছে। সেখানে প্রতিবন্ধী বাচ্চা একা একা এটা করতে পারছেনা। তার বড়দের সাহায্য লাগছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখাতে গেলে অনেক ধৈর্য্য লাগে। এক জিনিস বার বার শিখাতে হয়। এই ধরণের শিশুদের মধ্যে লোকলজ্জার ভয়, কোন কথা বলা যাবে আর কোন কথা বলা যাবেনা সেই জ্ঞান কম থাকে।

মানসিক বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা চার ধরণের হয়।

১. মৃদু মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা (এদের আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক থাকে ৫০-৭০ এর মধ্যে)
২. মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা (এদের আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক থাকে ৩৫-৪৯ এর মধ্যে)
৩. চরম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা (এদের আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক থাকে ২০-৩৪ এর মধ্যে) এবং
৪. অতিরিক্ত চরম মাত্রার (এদের আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক থাকে ২০ এর নিচে)।

উল্লেখ্য বুদ্ধির একককে বলে আইকিউ বা বুদ্ধাঙ্ক। বিভিন্ন ধরণের মনোবৈজ্ঞানিক বুদ্ধি পরিমাপক দিয়ে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। যেমন, ওয়েক্সলারের বুদ্ধি পরিমাপক স্কেলগুলো দিয়ে বুদ্ধি পরিমাপ করা যায়। উল্লেখ্য সাধারণ মানুষের আইকিউ গড়ে ৯০- ১০৯ এর মধ্যে থাকে।

মৃদু মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধির একক বা আইকিউ স্কোর থাকে ৫০ থেকে ৬৯ এর মধ্যে। এরা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারে। তবে তারা পরীক্ষায় সচরাচর খারাপ করে। হয়তো এক দুটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে বিশেষ বিবেচনায় পাশ করে। তারা নিজেদের যত্ন নিজেরা নিতে পারে, যেমন একটু বড় হলে তার সাধারণ কেনাকাটা করতে পারে, গাড়িতে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে একা একা যেতে পারে। এরা বড় হয়ে সাধারণ পেশায় নিয়োজিত হতে পারে।

মধ্যম মাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের বুদ্ধাঙ্ক বা আইকিউ ৩৫-৪৯ এর মধ্যে থাকে। এই স্তরের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের অনেক অল্প বয়সেই বোঝা যায়। তাদের ভাষার বিকাশ দেরিতে হয়, এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সমাজে চলার জন্য প্রচুর সহযোগীতা দরকার হয়। তারা তেমন একটা লেখাপড়া করতে পারেনা। তবে প্রচুর চেষ্টা করে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে শিখানো যায়, তাদের সাধারণ কাজ-কর্ম, নিজের যত্ন নিজে নেয়ার দক্ষতা কিছুটা শিখানো যায়। ইতিবাচক পরিবেশে বিশেষ তত্বাবধানে তারা সীমিত পর্যায়ের পেশাগত কাজ করতে পারেন। তাদেরকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলে স্পেশাল এডুকেশন টিচারদের তত্বাবধানে শিখালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

যাদের তীব্র বা অতিরিক্ত তীব্র বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা থাকে তাদের বুদ্ধাঙ্ক বা আইকিউ ৩৫ এর নিচে থাকে। তাদের নিবীড় তত্বাবধানে রাখতে হয়। জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনী দক্ষতাগুলো তারা অত্যন্ত সীমিত পরিমাণে শিখতে পারে। এদের মধ্যে প্রায়ই নানা ধরণের শারীরিক রোগ থাকে। এদের গড় আয়ু সাধারণ মানুষদের থেকে বেশ কম হয়।

এক তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার কারণ জানা যায়না। বিভিন্ন রোগের প্রভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে। ডাউন্স সিন্ড্রোম, ভেলোকেরিওফেসিয়াল সিন্ড্রোম, এবং ফেটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম জন্মগত বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী। কখনো কখনো পিতামাতার থেকে প্রাপ্ত অস্বাভাবিক জ্বীন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার কারণ হিসাবে কাজ করে। এর মধ্যে ডাউন্স সিন্ড্রোম, ক্লিনফেল্টারস সিন্ড্রোম, ফ্র্যাজাইল এক্স সিন্ড্রোম, নিউরোফাইব্রোম্যাটোসিস, কনজেনিটাল হাইপোথাইরয়েডিজম, উইলিয়ামস সিন্ড্রোম, পেনিলক্যাটোনিউরিয়া এবং পারজার উইলি সিন্ড্রোম মানসিক প্রতিবন্ধীতার জন্য দায়ী থাকে।

গর্ভাবস্থার সমস্যার জন্য বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীতা হতে পারে। যদি ভ্রুণ সঠিক ভাবে বিকশিত হতে না পারে, গর্ভকালীন সময়ে যদি মা অ্যালকোহলে আসক্ত থাকেন, গর্ভাবস্থায় যদি মা রুবেলা ভাইরাস সংক্রমিত হয়ে পড়েন তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে।

জন্মকালীন সমস্যার কারণেও বুদ্ধি প্রতবিন্ধীতা হতে পারে। মায়ের গর্ভকালীণ ব্যথার সময়ে বা সন্তান জন্মগ্রহণকালীন সময়ে যদি শিশু পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহ না পায় তবে মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে।

কিছু রোগ ও বিষাক্ততার প্রভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে। যেমন, হুপিং কাশি, মিজল্স্, মেনিনজাইটিস রোগের সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে। সীসা বা লিড, মারকারি ইত্যাদি বিষাক্ততার শিকার হয়েও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হতে পারে। আয়োডিনের ঘাটতির কারণে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হতে পারে। অপুষ্টির কারণেও এটি হতে পারে। খড়া, দূর্ভিক্ষ, যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে শিশুদের মধ্যে তীব্র অপুষ্টি তৈরী হতে পারে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার পূর্ণ চিকিৎসা নেই। বুদ্ধি বাড়ানোর কোন ফলপ্রসু উপায় নেই। বুদ্ধির ঘাটতি সত্যেও কিভাবে ভাল ভাবে জীবন-যাপন করা যায়, স্বনির্ভর হওয়া যায় সেই উপায়গুলো প্রতিবন্ধী শিশুকে শিখানো হয়। এই শিক্ষাগুলো প্রয়োগিক ধরণের হয়। বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সিলেবাসও আলাদা হয়। তাদের বুদ্ধির পর্যায় অনুযায়ী তাদের কারিকুলাম বা পাঠ্য সূচী দেয়া হয়। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিখানোর জন্য বাংলাদেশে কিছু স্পেশাল এডুকেশন স্কুল আছে। এখানে এই ধরণের শিশুদের বিশেষ যত্নের সাথে পড়ানো হয়। এই স্কুল গুলোতে স্পেশাল এডুশেন শিক্ষকেরা পড়ান। এই স্কুলগুলো মূলতঃ রাজধানীসহ বড় বড় শহরকেন্দ্রীক। স্কুলগুলোর আসন সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কম। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বি পি এফ) কল্যাণী বলে একটি স্কুল পরিচালনা করছে। এই ফাউন্ডেশন ছয়টি গ্রামাঞ্চলে ও তিনটি শহরাঞ্চলে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইন্টারনেটে ‘bangladeshprotibondhifoundation.org’- এই ঠিকানায় ক্লিক করলে এই ফাউন্ডেশন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। সোসাইটি ফর ওয়েলফেয়ার অব দি ইন্টিলেকচ্যুয়ালি ডিজঅ্যাবল্ড, বাংলাদেশে (এস ডব্লিউ আই ডি-বাংলাদেশ) নমের আরেকটি প্রতিষ্ঠান বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে। ৪/এ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় তাদের কেন্দ্রীয় অফিস। সারা দেশে বিভিন্ন জেলায় তাদের ৮৫টি স্কুল আছে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার জন্য সরকারি পর্যায়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সরকার প্রতিবন্ধী স্কুলগুলোর কার্যক্রমে সহায়তা করছেন। এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ইন্টারনেটে ঢুকে ‘অরগানাইজেশন্স্ ওয়ার্কিং অন অটিজম এন্ড নিউরো ডিজঅ্যাবিলিটি ইন বাংলাদেশ’ নামের একটি ফোরাম খুজে বের করলে এর সদস্যদের মধ্যে কারা মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন তা বের করে নেয়া যায়। এজন্য ইন্টারনেটে ঢুকে ‘www.parentsforum.org’ এই ঠিকানায় ক্লিক করতে হবে।

বিভিন্ন সরকারী মেডিকেল কলেজগুলোতে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপন, প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা ও প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রোগের জন্য ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা দেয়া হয়।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধী স্কুলে না পড়িয়ে সাধারণ স্কুলগুলোতে রেখে পড়াতে পারলে সবথেকে ভাল ফল পাওয়া যায়। তারা কতগুলো ক্লাশ সবার সাথে করবে আর কতগুলো ক্লাশ স্পেশাল এডুকেশন টিচারের তত্বাবধানে করবে। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে এধরণের সুযোগ গড়ে উঠেনি। সাভারের চাপাইনে সিআরপির তত্বাবধানে পরিচালিত স্কুলে বুদ্ধি ও অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অন্যান্য সুস্থ শিশুর সাথে একসাথে একই স্কুলে রেখে পড়ানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে মেইনস্ট্রিমিং। এর ফলে প্রতিবন্ধী শিশুর মনে নেতিবাচক প্রভাব কম পড়ে। নাহলে সে নিজেকে অসুস্থ বা প্রতিবন্ধী ভাবতো। আমাদের দেশে অনেক সময় বিশেষিত স্কুলগুলোকে অজ্ঞ লোকেরা পাগলের স্কুলও বলে ফেলেন। মেইনস্ট্রিমিং হলে এই সমস্যা থাকেনা। পুরো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়, স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ানোর ব্যবস্থা করতে গেলে সরকারী

নীতিমালা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষক ও সচেতন মানুষদের এজন্য এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়ায় আরেকটি সমস্যা হয়। যারা স্বল্পমাত্রার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী তার সাধারণ স্কুলগুলোতে পেড়ে উঠেননা। শিক্ষকরা তাদের অপদার্থ ও ফাকিবাজ মনে করে শাসন করেন। এই শিশুদের বাবা-মাও প্রতিবন্ধীতার বিষয়টি না বুঝে শিশুকে বকা-ঝকা করেন। অন্যদিকে এই শিশুরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার বিশেষিত স্কুলে গেলে তারা সেখানেও খাপ খাওয়াতে পারেননা। কেননা সেখানে যেসব শিশু পড়ে তারা তীব্রতর বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতায় ভুগছে।

কোন ঔষধের মাধ্যমে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তবে এই প্রতিবন্ধীদের একটি অংশের মধ্যে আচরণ সমস্যা থাকে। বোঝার ক্ষমতা ও শিখার ক্ষমতার ঘাটতির কারণে তারা অনেক সময় ভাঙচুর করে, অন্যকে মারে বা নিজেকে নিজেই অঘাত করে। যেমন, অনেকে দেয়ালে মাথা ঠুকে ও হাত কামড়ায়। অনেক শিশুদের মধ্যে মাত্রারিক্ত অস্থিরতা থাকে। অনেকের মধ্যে রাগ অতিরিক্ত হয়। অনেকের মধ্যে কিছু গুরুতর ধরণের মানসিক রোগ বা সাইকোসিসের লক্ষণ দেখা যায়। তাদের মধ্যে অন্যান মানসিক রোগও থাকতে পারে। এছাড়া মধ্যম ও তীব ধরণের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে এপিলেপ্সি বা এধরণের অনেক শারীরিক রোগ দেখা যায়। এসব শারীরিক ও মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ঔঁষধ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। এছাড়া আচরণ সমস্যাসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য প্রয়োজনে সাইকোথেরাপি দেয়া যেতে পারে। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক রোগের চিকিৎসায় মানসিক রোগের ডাক্তার, সাইকোলজিষ্ট ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সমণ্বয়ে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের ধৈর্য্য ধরতে হবে। এধরণের শিশুদের বুদ্ধি কম হওয়াটা তাদের দোষ নয়। সৃষ্টিকর্তা তাদের এভাবে পাঠিয়েছেন। তাদেরকে একদম মারপিট বা বকাঝকা করা যাবেনা। তাদেরকে ভালবাসা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, আদর দিয়ে, প্রয়োজনে পুরষ্কার দিয়ে শিখাতে হবে।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে ও তাদের বিভিন্ন ধরণের রোগের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের সাধারণ স্কুলগুলোতে তাদেরকে রেখে পড়ালেখা করানোর উদ্যোগ নেয়াটা জরুরী। এছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের সংখ্যাও বাড়ানো দরকার। মনে রাখতে হবে প্রতিরোধই সবথেকে উত্তম। একবার বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতা হয়ে গেলে তার পুরোপুরি সমাধান অসম্ভব। কিন্তু গর্ভবস্থায় মায়ের যত্ন নিশ্চিত করলে, তাদের যথাযথ চিকিৎসর ব্যবস্থা করলে, সন্তান জন্মদান ও সদ্যজাত শিশুদের চিকিৎসা সেবা যথাযথ ভাবে দিতে পারলে, পরিবেশের বিষাক্ততা ও গুরুতর অসুখগুলো থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারলে, শিশুর জন্য সুষম ও আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করতে পারলে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীতার হার অনেক কমিয়ে আনা যায়। আসুন সবাই মিলে শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়ি, শিশুর সুস্থতা নিশ্চিত করি ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথ যত্ন নিশ্চিক করি।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।